পঞ্চম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটকে প্রদর্শন শৈলীগত রূপান্তর

সময়ের সাথে সাথে মানবজীবনের পরিবর্তন যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনই মানবজীবনের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত সমাজের উপরও পরিবর্তনের ছাপ অজান্তেই পড়ে যায়। আর এই পরিবর্তন সমাজের উপর এতটাই দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে, তার প্রভাব সংস্কৃতিতেও পড়ে। ফলে অনিবার্যভাবে তথাকথিত শিষ্ট সংস্কৃতির পাশাপাশি লোকসংস্কৃতির আঙিনাতেও এই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত লোকনাটকের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার, রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বিভিন্ন গণ আন্দোলন প্রভৃতি অন্যান্য অঞ্চলের মত উত্তরবঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রুচি ও চাহিদার রূপান্তর লক্ষণীয়। আধুনিক নাটক, যাত্রা, সিনেমা ইত্যাদির ব্যাপক প্রভাব পড়ছে জনসাধারণের মনে। তাই রুচির দিক থেকে দর্শক ও শ্রোতা উভয়েই আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠছে। তবে লোকনাটকের দর্শক ও শ্রোতার রুচি ও চাহিদা উত্তরোত্তর বদলে যাওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় আধুনিক সমাজ। এই সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়েই উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলিতে আঙ্গিক ও প্রদর্শনশৈলীগত রূপান্তর ঘটে চলেছে। দর্শক ও শ্রোতার রুচি এবং চাহিদামত নতুন নতুন উপাদান সংযুক্ত হতে থাকে। একথা অবশ্য স্বীকার্য আধুনিক সিনেমা, নাটক, যাত্রা প্রভৃতি সমাজে এতটাই স্থান করে নিয়েছে যে এর চাপে পড়ে লোকনাটক প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মুখে। লোকনাটকের বহু দল যেগুলি পূর্বে জনপ্রিয়তায় শীর্ষে ছিল, সেই দলগুলির বেশিরভাগ সঠিক পরিচালনা, আর্থিক অসঙ্গতি, কুশীলব ও জনপ্রিয়তার অভাবে হারিয়ে গেছে। এখন গুটিকয়েক যে সমস্ত দল রয়েছে তারা কোনক্রমে এই প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার জন্য লড়াই করে চলেছে। বলা যায় আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থার সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকরা লোকনাটকের উপস্থাপন ও অভিনয়ের দিক থেকে অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছেন। শুধু তাই নয় লোকনাটকের প্রদর্শনশৈলীগত বিভিন্ন উপাদানগুলিরও নানা পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তবে একথা কেবল উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে নয়, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত লোকনাটকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের আলোচ্য উত্তরবঙ্গের লোকনাটকগুলির উপস্থাপন ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে যেসব উপাদানের রূপান্তর হচ্ছে সেগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা— (ক) মঞ্চরীতি, (খ) সাজসজ্জা, (গ) পোশাক-পরিচ্ছদ, (ঘ) বাদ্যযন্ত্র, (ঙ) আলোকসজ্জা।

মঞ্চরীতি ঃ

লোকনাটকের আসর কী ধরণের হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "তাতে সাজঘর বলে কিছু নেই। সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের চারদিক ঘিরে বসে, যখন যার অভিনয় করবার প্রয়োজন তখন সেই সেখান থেকে উঠে এসে অভিনয় করে, আবার গিয়ে সেখানেই বসে থাকে।"[১] আবার সনৎ কুমার মিত্র মনে করেন, "লোকনাটক মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়। এর চারদিকই খোলা। বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে দর্শকেরা আসরের চারদিকে গোল হয়ে বসে-কোন প্রসেনিয়ামের (Proseenium) বাধা থাকে না।"[২] অর্থাৎ মুক্ত মঞ্চ হওয়ায় এবং প্রসেনিয়ামের কোনো বাধা না থাকায় দর্শক ও শ্রোতা মাঝে মধ্যে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে শিশির মজুমদার বলেছেন, "লোকনাট্যের ক্ষেত্রে সবসময় মঞ্চ পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট কোন স্থান নয়। নাট্যের পৃষ্ঠপোষক বা প্রযোজক-গৃহস্থের অঙ্গন (উঃ ও দঃ দিনাজপুর), খাস বা 'ধাম' (জলপাইগুড়ি) বা অকর্ষিত জমির সমতলভূমি এর মঞ্চ। শুধু অনুষ্ঠানের আগে খড় বা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হয় আসর এলাকা। বিশেষভাবে মঞ্চের উপর টানানো হয় চাঁদোয়া, অভাবে বর্গায়ত চাদর। বাদ্যযন্ত্রী-কুশীলব যেখানে বসেন সেখানে হাতে তৈয়ারি পাটের ধোকড়া (শতরঞ্জী) পেতে দেওয়া হয়। অভিনয়ের স্থান সাধারণতঃ উন্মুক্ত-শক্ত মাটি কিংবা তৃণাচ্ছাদিত।"[৩] তবে কেবল উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ির লোকনাটকের মঞ্চরীতির ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের ক্ষেত্রে মঞ্চরীতির এমন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যেতে পারে। পল্লব সেনগুপ্ত লোকনাটকের মঞ্চরীতি প্রসঙ্গে বলেছেন, "সাধারণভাবে লোকনাট্য, মুক্ত অঙ্গনে-খোলা মাঠে কিংবা চাষের জমিতে অথবা গ্রামদেবতার থানের সামনে অভিনীত হয়।"[৪] আবার মানস মজুমদার মনে করেন, "লোকনাট্যের অভিনয়-আসরে উপস্থিত হ'লে দেখতে পাই, অভিনয় মঞ্চ ব'লে কিছু নেই। চারদিক খোলা আসরে দর্শকদের মাঝখানে চলে অভিনয়। অভিনেতা আর দর্শক-শ্রোতাদের কাছাকাছি অবস্থান।"[৫] সুতরাং বলা যায় লোকনাটক অভিনীত হত গৃহস্থের উন্মুক্ত উঠোনে, গ্রাম দেবতার থানে কিংবা খোলা মাঠে। অতিপ্রাচীন কাল থেকে লোকনাট্যের স্থানটি ছিল বৃত্তাকার। এ প্রসঙ্গে মনে করা হয় আদিম সাম্যবাদী সমাজে প্রাকৃতিক শক্তির আধার রূপে সূর্য পুজনীয় ছিল। সূর্যের সেই গোলাকার চিহ্নই যুগ যুগ ধরে শুভ প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই আসরের চারদিক ঘিরে দর্শকেরা বসত। ফলে সহজেই চরিত্রগুলি দর্শক ও শ্রোতার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংযোগ স্থাপন করতে পারত। আসরের উপর চাঁদোয়ার মত কাপড় কিংবা পাটকাঠির আচ্ছাদন দেওয়া হত এবং নীচে বসার জন্য চাদর বা বস্তা পেতে দেওয়া হত। এক্ষেত্রে আলাদা কোন সাজঘরের ব্যবস্থা ছিল না। অভিনেতারা সাজসজ্জা করে আসরেই বাদ্যযন্ত্রীদের পাশে বসে থাকত। অভিনয়ের সময় তাঁরা উঠে এসে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করত।

কিন্তু ইদানীং লোকনাটকের আসরের ক্ষেত্রে বিরাট রূপান্তর ঘটেছে। জনপ্রিয়তার ঘাটতির দরুণ লোকনাটকের দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা দিন দিন কমে চলেছে। ফলে আগের মতো জনসমাগম এখন আর হয়

না। তাই জনসমাগম বৃদ্ধি করতে প্রযোজকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির আদলে মঞ্চ তৈরি করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লোকসংস্কৃতির জন্মভূমি গ্রামে-গঞ্জে এখন সিনেমার নায়ক-নায়িকা ভাড়া করা যাত্রার রমরমা বাজার। তাই এই ধরণের গ্রাম্য পরিবেশে সাধারণ মানুষের দ্বারা অভিনীত লোকনাটকের চেয়ে যাত্রা গ্রামের মানুষের কাছে অতি উপভোগ্য। অবশ্য এর পেছনে যে কেবল আধুনিক বিনোদন ব্যাবস্থাই দায়ী, তা নয়। আসলে মানুষের মনন ও চিন্তনের পরিবর্তন ঘটছে। ফলে মানুষের রুচির দিকে লক্ষ রেখে লোকনাটককেও পরিবর্তিত হতে হচ্ছে। তাই "...নাটকে যে উঁচু প্ল্যাটফর্ম তৈয়ারি করে মঞ্চ সৃষ্টি তা পরবর্তীকালের ব্যাপার। উঁচু মঞ্চ তৈয়ারির সঙ্গে সঙ্গে নাটক ও কুশীলব দর্শকদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। নাট্যমঞ্চে সূচিত হয় এক নূতন যুগ।"[৬] অর্থাৎ যখনই যাত্রার আঙ্গিকে লোকনাটকেও মাটি কেটে উঁচু প্ল্যাটফর্ম বা মঞ্চ তৈরি শুরু হল সেই সময় থেকে লোকনাটকের আসর বৃত্তাকার থেকে হয়ে গেল বর্গাকৃতি। যেমন— আদিতে কুশানের মঞ্চ ছিল গোলাকার, কিন্তু বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে বর্গাকৃতি রূপ নিয়েছে। এ প্রসঙ্গে খন গানের আসরের কথা তুলে ধরে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "অন্যান্য লোকনাট্যের মতো বাড়ির খলানে, উঠোনে বা গ্রামের কোনো খোলা জায়গায় এই পালাগানের আসর বসে। চারদিকে দর্শকসাধারণের মাঝামাঝি কোনো জায়গায় আসর বসে। ইদানীং কোথাও কোথাও তিন দিক খোলা মঞ্চেও আসর অনুষ্ঠিত হয়।"[৭] অর্থাৎ খন গান মুক্ত উঠোনে কিংবা মাঠে অভিনীত হলেও, বর্তমানে তিন দিক খোলা স্টেজ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। খন গানের মঞ্চরীতি সম্পর্কে শিশির মজুমদারও বলেছেন, "কুশীলবরা সাজ পোশাক করে মঞ্চের মধ্যস্থলে বাইনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। অভিনয় কালে উঠে এসে অভিনয়ে অংশ নেয়। তবে ইদানীং ভিন্ন সাজঘর হয়েছে। সাজঘর থেকে তারা দর্শকের মধ্য দিয়ে একফালি সরুপথে মঞ্চে যাতায়াত করে।"[৮]

শুধু তাই নয় গম্ভীরার মঞ্চসজ্জায় রূপগত যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সেই সম্পর্কে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "প্রাচীনকালে এই আসর সাজানো হত পদ্মফুল দিয়ে। পরবর্তীকালে নানা কারণে যথেষ্ট সংখ্যক পদ্মফুলের অভাব দেখা দিলে কাগজের পদ্মফুলে আসর সাজাবার প্রথা শুরু হয়। ...বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি, কালীঘাটের পট ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হত। রঙিন, নকশাদার বিশেষ ধরণের পট ও রামকেলীর বস্ত্রে অঙ্কিত ছবি দিয়ে আসর সাজানো হত। এছাড়া চাঁদোয়াও টাঙানো হত। আসরে বসার জন্য কোনো কিছুর ব্যবস্থা আগেকার দিনে ছিল না। কেউ কেউ বাড়ি থেকে চট, আসন ইত্যাদি আনত। মণ্ডপের যে অংশে নাচ গান হত সে অংশেও বসার কোনো ব্যবস্থা করা হত না। ধূলোয় বসা হত এবং ধূলোতেই নাচ গান হত।

ইদানীংকালে গম্ভীরা মণ্ডপে সাজাবার ব্যবস্থা তেমনভাবে করা হয় না। কোনো কোনো গ্রামে সামান্য কিছু ব্যবস্থা করা হয়। ... আগে গ্রিনরুম থাকত না। এখন চালু হয়েছে।"[৯] আবার প্রদ্যোত ঘোষ মনে করেন, "প্রায় বার থেকে ষোল ফুট ব্যাসযুক্ত গোলাকার অংশকে আসর করে চারদিকে বৃত্তাকারে শ্রোতা বা দর্শকেরা ভূমি আসন গ্রহণ করে। ওপরে থাকে সামিয়ানা বা অন্য কোন আচ্ছাদন। একটু দূরে থাকে গ্রীনরুম বা সাজঘর।

আসরের একপাশে বসে বাজিয়ে এবং গায়কেরা।"[১০] এ থেকে বোঝা যায় গম্ভীরার মঞ্চসজ্জার এই যে ব্যাপক পরিবর্তন তা একদিনে ঘটেনি। প্রথমদিকে মঞ্চসজ্জায় যে সমস্ত উপকরণ ব্যবহার করা হত, পরবর্তীতে সেগুলি অপর্যাপ্ত কিংবা দূর্লভ হওয়ায় আর ব্যবহার করা হয় না। তবে এদিক দিয়ে নতুনত্ব হল গ্রিনরুমের ব্যবহার। এখন প্রায় প্রতিটি লোকনাটকেই গ্রিনরুমের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অভিনয়ের আসর থেকে কিছুটা দূরে অস্থায়ী গ্রিনরুম তৈরি করা হয়। সেই গ্রিনরুম থেকে আসরে যাওয়া আসার জন্য একটি সরু রাস্তা থাকে। গ্রিনরুম ব্যবহারের একটা বিশেষত্ব রয়েছে সেটি হল দর্শকদের মনে উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রাখা, যা পূর্বের লোকনাটকগুলিতে সেভাবে প্রকাশ পেত না। কারণ সেক্ষেত্রে চরিত্রেরা আগে থেকেই সেজে এসে আসরে বসে থাকত।

এছাড়া আসরে এখন মাইকের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। পূর্বে দর্শক ও শ্রোতার কাছে অভিনয়ের সংলাপ পৌঁছানোর জন্য জোরে জোরে বা প্রায় চিৎকার করতে হত। যাতে তাদের আবেগদীপ্ত সংলাপ শ্রোতার বোধগম্য হয়। এর জন্য শিল্পীরা কণ্ঠস্বরকে যতদূর সম্ভব উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন। উপরন্তু সেই সময় "আসরে মাইকের ব্যবহার শিল্পীদের অক্ষমতার পরিচায়ক ছিল।"[১১] তবে এখন মাইকের ব্যবহার লোকনাটকের একটি অপরিহার্য উপাদানে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে অভিনেতারাও এই ধরণের শারীরিক ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন।

সাজসজ্জা ঃ

লোকনাটকের চরিত্রগুলি সাজসজ্জার দিক থেকে তেমন পরিপাট্য ছিল না। একেবারেই সাদামাটা সাজে অভিনেতারা আসরে উপস্থিত হতেন। তবে এদের মধ্যে কেবল ছুকরী চরিত্রটি সুসজ্জিত হয়ে আসরে নামতেন। শিল্পীদের ব্যবহৃত সাজসজ্জার উপকরণগুলি গ্রামজীবনে খুব সহজেই পাওয়া যেত। অর্থাৎ গ্রামজীবনে যা সহজলভ্য, যেমন— ভুষাকালি, সিঁদুর, আলতা, হলুদবাটা, খড়িমাটি প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রী হিসেবে শিল্পীরা তাদের সাজসজ্জায় ব্যবহার করত। তাই প্রসাধন সামগ্রীর ক্ষেত্রে তেমন ব্যয় ছিল না।

কিন্তু এখন বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জার উপকরণ অর্থাৎ প্রসাধন সামগ্রী বাজারে ছড়িয়ে পড়ায় তা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করছে সহজেই। বর্তমান প্রজন্মকে তো বটেই। আবার যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতির দৌলতে প্রতিটি মানুষের সাজসজ্জায় এসেছে পরিবর্তন। তাই লোকনাটকেও সাদামাটা গ্রাম্য ভাব কাটানোর জন্য নানা ধরনের প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে চরিত্রগুলি নিজেদের সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যই নানা ধরণের সাজসজ্জার উপকরণের ব্যবহার। এই পরিবর্তিত সাজসজ্জার উপকরণের উল্লেখ করে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "শিল্পীরা মেক আপের জন্য ব্যবহার করেন— পাউডার, ক্রিম, পিউরি, মিনা, ক্রেপ, জিঙ্ক অক্সাইড, স্পিরিটগাম, পরচুলা প্রভৃতি।"[১২] আবার শিশির মজুমদার খন গানের অভিনেতাদের সাজসজ্জা সম্পর্কে বলেছেন, ছোকরা চরিত্রটির "হাতে কাচের চুড়ি গলায় মালা। চুল

খোঁপা করে বাঁধা, গায়ে রঙীন ব্লাউজ। ... 'নাহিড়ী' বা নায়িকা, 'মুড়ি' বা নায়ক এবং যে চরিত্রটি 'ওসিয়া' বা 'ফাত্রা'র মুখে জিঙ্ক অক্সাইড পাউডার দিয়ে সাদা করে দেওয়া হয়।"[১৩] বলা বাহুল্য এ সমস্ত উপকরণ গ্রামের মানুষের কাছে যেমন দুর্লভ, তেমনি যথেষ্ট ব্যায়সাধ্য। যা লোকনাটকের শিল্পীদের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব ছিল না। তবে এখন এ ধরণের প্রসাধন সামগ্রী প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। ফলে মঞ্চসজ্জার পাশাপাশি সাজসজ্জায়ও এসেছে নানা পরিবর্তন। তাই এখন লোকনাটকগুলির প্রায় প্রতিটি চরিত্রই কিছু না কিছু মেক-আপ নিয়ে থাকে। তাঁরা সাজসজ্জার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে মেক-আপ পাউডার, ফাউন্ডেশন, লিপস্টিক, কাজল, স্টোন বসানো মালা, চুড়ি প্রভৃতি।

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ

পোশাক পরিচ্ছদ শুধুমাত্র মানবদেহকে আবৃত করে তাই নয়, মানবদেহকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে এক অন্য মাত্রা দেয়। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে নিতান্ত অনাড়ম্বর ও সাধারণ পোশাকে কুশীলবেরা অভিনয় করতেন আসরে। পুরুষেরা ধুতি পাঞ্জাবী, এবং গীদালের গায়ে থাকে নামাবলী (বিশেষ বিশেষ লোকনাটকের ক্ষেত্রে)। ছুকরী চরিত্রটি শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ ও পরচুলা ব্যবহার করে। এছাড়া দোয়ারী বা বতেয়া চরিত্রটি নিজেকে হাস্য উদ্রেককারী করে তুলতে হাস্যকর পোশাক পরিধান করে, যেমন— ছেঁড়া গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট, কখনো বা পায়জামার একটা পা অর্ধেক করে কাটা ইত্যাদি। অবশ্য প্রায় প্রতিটি লোকনাটকের বতুয়া বা দোয়ারীর পোশাকে এ ধরণের বৈচিত্র্যের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। যা পালাগুলিতে হাস্যরসের ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। খন পালার চরিত্রগুলির পোশাক সম্পর্কে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "সাজসজ্জা ও পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ। নারী-চরিত্র ও জোকার বা বিদূষক চরিত্রের সাজপোশাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত পুরুষ চরিত্রের হাতে বা কাঁধে গামছা এবং নারী চরিত্রের হাতে রুমাল থাকে।"[১৪] আবার গম্ভীরার ক্ষেত্রে দেখা যায় বতেয়া চরিত্রটির ছেঁড়া গেঞ্জির ওপর অনেকগুলি মেডেল ঝোলানো থাকে। এ ধরনের পোশাক আর কোনো লোকনাটকে দেখা যায় না। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রগুলি সাধারণত পাঞ্জাবী-পায়জামা অথবা শার্ট-প্যান্ট পড়ে থাকে। তাই "গম্ভীরা গানের শিল্পীদের রূপসজ্জার বিষয়টি বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। এঁদের সাজসজ্জার মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারটি হয় একেবারেই অন্যরকম। গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় হাতে ছেঁড়া ন্যাকড়া বাঁধা, ধুতিও থাকে ময়লা-ছেঁড়া। মুখে চোখে সামান্য মেক-আপ। শিবের চরিত্রে যিনি অভিনয় করেন তাঁর পরণে থাকে বাঘছাল, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল এবং বা হাঁতে থাকে ডম্বরু।"[১৫] গম্ভীরা লোকনাটকের পোশাক-পরিচ্ছদের বিশেষ পরিবর্তন না হলেও চরিত্রগুলির পোশাকের মধ্যে এখন মার্জিত রূপ লক্ষ করা যায়। এছাড়া অন্যান্য লোকনাটকগুলিতে বিশেষ করে পালাটিয়া, খন প্রভৃতি লোকনাটকে চরিত্র অনুযায়ী পোশাক ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন— পুলিশ, ডাক্তার, উকিল, রাজা-বাদশা প্রভৃতি চরিত্রের অনুরূপ পোশাক পড়তে দেখতে পাওয়া যায়। 'পালাটিয়া'য় ছুকরী চরিত্রগুলি পূর্বে ঘাগড়া পড়ত। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন অঞ্চলে তাদের শাড়ি পড়তে দেখা যায়।[১৬]

এই রূপান্তরের পেছনে কারণ হিসেবে মানস মজুমদার সিনেমা, পেশাদারী যাত্রা ও মঞ্চাভিনয়ের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৭] আবার অনেক ক্ষেত্রে জরির পোশাক, ঢাল তলোয়ার, পিস্তল প্রভৃতিও ব্যবহার হয়। চরিত্র অনুযায়ী এই ধরণের পোশাক যদি কেনার সামর্থ্য না থাকে কোন দলের, তবে সেক্ষেত্রে এগুলি ভাড়া করা হয়। এ প্রসঙ্গে সনৎ কুমার মিত্র বলেছেন, "... তবে আজকাল কোন কোন পালায় কোন কোন দল ঝকমকে যাত্রার পোশাক ভাড়া করে নিয়ে আসে।"[১৮] সুতরাং বলা যায় আধুনিক সমাজব্যবস্থায় জনমনোরঞ্জনের জন্য লোকনাটকের দলগুলি পোশাক পরিচ্ছদের নানাতর পরিবর্তন ঘটিয়ে চলেছেন, যা পূর্বে ছিল অভাবনীয়।

বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ লোকনাটকে মুখোশের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 'নটুয়া'র 'বতেয়া' চরিত্রের কালিমাখা মুখ দেখে মনে হয় নটুয়া পালায় একসময় হয়ত মুখোসের ব্যবহার ছিল।[১৯] কুশান গানেও মুখোসের ব্যবহার থাকলেও আজ আর তা দেখা যায় না। কিন্তু ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে মুখোশ শিল্প তেমন লাভজনক না হওয়ায় এর সাথে যুক্ত শিল্পীরা জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে কিংবা অন্য পেশায় প্রবেশ করেছে। ফলে মুখোশের উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এছাড়া বিদেশের বাজারে এ ধরণের মুখোশের মূল্য অনেক বেশি। তাই ভারতের বিশেষত উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকাগুলি থেকে চোরাকারবারীদের হাতে মুখোশগুলি বিদেশে চালান হয়ে চলেছে। তবে কিছু কিছু লোকনাটকের ক্ষেত্রে যেখানে মুখোশের ব্যবহার অপরিহার্য, সেখানেই কেবল মুখোশের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

বাদ্যযন্ত্র ঃ

বাদ্যযন্ত্র লোকনাটকের একটি অন্যতম উপাদান। এর মাধ্যমেই কখনো আবেগের সুর ভেসে ওঠে, আবার কখনো বা কান্না-হাসির সুর দোলা দেয়। লোকনাটকের ক্ষেত্রে এই বাদ্যযন্ত্র পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। পূর্বে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে ব্যবহৃত হত দোতরা, ব্যানা, মুখা বাঁশি, করতাল, ঢাক, ঢোল, কাঁসি প্রভৃতি। তবে হারমোনিয়াম, ফ্লুট, সানাই, ক্যাসিও প্রভৃতি ইদানীংকালে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সনৎ কুমার মিত্র বলেছেন, "আঞ্চলিক এবং লৌকিক বাদ্যযন্ত্রই সুরসৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন উত্তরে ব্যানা, দোত্‌রা, মুখাবাঁশি, মৃদঙ্গ, সঙ্গে ঢোল-কাঁসি, ঢাক, হারমোনিয়াম, ফ্লুট, করতাল ইত্যাদিরও ব্যবহার লক্ষ করা যায়।"[২০] লোকনাটকের বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে শিশির মজুমদার মনে করেন, "খোল, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, দোতরা, খমক, ঢোল, বাঁশী, মেহনা (সানাই), ঢাক, হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, এসব হলো প্রত্যেক লোকনাট্যের বাদ্যযন্ত্র। হারমোনিয়াম ডুগিতবলা ছাড়া এখন খন বা পালাটিয়া শুধু নয়, কোনো লোকনাট্যের আসর জমে না। প্রবীণ শিল্পীদের জিজ্ঞাসা করে জেনেছি পূর্বে হারমোনিয়াম ডুগিতবলার কথা জানা ছিল না। ঢোল, তাল (করতাল), দোতরা, খমক একটা বাঁশী এই নিয়ে বাদ্যযন্ত্রীরা আসর জমাতেন।"[২১] আবার মানস মজুমদারের মতে, "ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, ধামশা, শিঙ্গা, সানাই, কাঁশি, বাঁশি, ফুলুট, দোতরা,

সারিন্দা, বেহালা, তবলা, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার চোখে পড়ে। ইদানীং হারমোনিয়ামও কোনো কোনো আসরে স্থান পাচ্ছে।"[২২]

অর্থাৎ যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে লোকনাটকের রচয়িতা ও প্রযোজকেরা সুরের ক্ষেত্রে নতুনত্ব নিয়ে আসার জন্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নানাতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে অনেক নতুন বাদ্যযন্ত্র লোকনাটকের আসরে স্থান পেয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আরও পাবে। তাই প্রায় প্রতিটি লোকনাটকের বাদ্যযন্ত্রে এসেছে পরিবর্তন, আমদানী হয়েছে নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্রের। খন গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে পুষ্পজিৎ রায় বলেছেন, "খোল, ঢোলক, হারমোনিয়াম, বাঁশি, জুড়ি বা করতাল, তবলা, ছোটো আকারের সানাই, ব্যাণা [বীণাযন্ত্রের মতো] প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়।"[২৩] এখানে উল্লেখ্য, ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত খন গানে সানাই-এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। আবার শিশির মজুমদারের মতে, " 'খন'-এ বাদ্যযন্ত্র হলো— হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা, করতাল, বাঁশি । তবে খোঁজ খবর নিয়ে জেনেছি, হারমোনিয়াম অন্ততঃ ৫০ বছর আগে চালু ছিল না। ডুগি-তবলাও নয়। খোল বা ঢোল, বাঁশি ও করতালই ছিল এর বাদ্যযন্ত্র।"[২৪]

অপরদিকে গম্ভীরা লোকনাটকে প্রথমে কেবল ব্যবহৃত হত ঢোলক ও করতাল। কিন্তু পরবর্তীকালে এর মধ্যে নতুন নতুন অনেক বাদ্যযন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে প্রদ্যোত ঘোষ বলেছেন, "বর্তমানে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে আছে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, বাঁশি ও জুড়ি। আদিতে ছিল কেবল ঢোল ও কাঁসি। তার পরবর্তী পর্যায়ে এসেছে ঢোলের সঙ্গে হারমোনিয়াম, ডুগি-তবলা ও মন্দিরা। আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে গোপাল দাস [দাস গোপাল নামে পরিচিত], হরিমোহন কুন্ডু, শরৎ দাস ও মোহম্মদ সূফীর আমলে ঐ সব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। বাঁশির ব্যবহার হাল আমলের।"[২৫] এই একই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন পুষ্পজিৎ রায়, তিনি বলেছেন, "গম্ভীরা পালায় সাধারণত যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বা বাজনা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— ঢোলক, জুড়ি, তবলা, বাঁশি, করতাল, হারমোনিয়াম, ফ্লুট, কর্নেট। ...এখানে উল্লেখ্য এই যে ঢোলক ও জুড়ি ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বাজনাই পরবর্তীকালের সংযোজন।"[২৬] অনুরূপভাবে কুশান লোকনাটকে আদিতে ব্যানা, ঢোল ও করতাল ছিল মুখ্য বাদ্যযন্ত্র। পরবর্তী পর্যায়ে এতে দোতরা, সারিন্দা, হারমোনিয়াম, সানাই ও ক্যাসিও স্থান পেয়েছে। বর্তমানে দু'ধরণের কুশান পালা পাওয়া যায়— ব্যাণা কুশান ও দোতরা কুশান। যে পালা ব্যাণার সাহায্যে পরিবেশিত হয় তা ব্যাণা কুশান, আর ব্যাণার বদলে দোতরা দিয়ে যে পালা পরিবেশন করা হয় তা দোতরা কুশান। কোন কোন অঞ্চলে এখন দোতরা কুশান প্রচলিত হয়েছে। তবে ব্যাণা কুশানের পরিবর্তিত রূপ যে দোতরা কুশান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পালাটিয়া লোকনাটকে নতুন বাদ্যযন্ত্রের সংযোজনের প্রসঙ্গে শিশির মজুমদার বলেছেন, "রঙপাঁচালীতে হারমোনিয়াম, ডুগিতবলা, ক্ল্যারিওনেট ব্যবহারও করতে দেখেছি। এগুলি যে কলকাতার যাত্রার প্রভাব, একথা না বলে দিলেও চলে।"[২৭] অর্থাৎ সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির সর্বাত্মক প্রভাব জনমানসে যে কতটা কার্যকারী তা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলা বাহুল্যমাত্র। সুতরাং এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি

লোকনাটকের ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে লোকনাটকের বিষয়কে মনোজ্ঞ করে তোলার জন্য এই রূপান্তর আনা হচ্ছে। বিশেষ করে আধুনিক যুবসমাজ; যারা সিনেমা, যাত্রা প্রভৃতির চটকদার সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রে অভ্যস্ত, তাদের লোকনাটকের প্রতি আকৃষ্ট করতে এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।

আলোকসজ্জা ঃ

গ্রামসমাজের লোকসাধারণকে কেন্দ্র করে রচিত লোকনাটক মূলত উপস্থাপিত হয় গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে। তাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকনাটক ছিল গ্রামাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সেই সময় গ্রামগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল না। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্ম লণ্ঠনের মাধ্যমেই সারতে হত। তেমনি লোকনাটকগুলিতেও পৃষ্ঠপোষকেরা হ্যাজাক ও লণ্ঠনের ব্যবস্থা করতেন। এই আলোকসজ্জা সম্পর্কে মানস মজুমদার বলেছেন, "ডে লাইট, হ্যাজাক বা পেট্রোম্যাক্সের আলোয় অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।"[২৮] কিন্তু দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে এখন প্রায় প্রতিটি গ্রামেই বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। আর যেখানে বিদ্যুৎ এখনও পৌঁছাতে পারে নি, সেক্ষেত্রে জেনারেটরের মাধ্যমে আলো জ্বালানো হচ্ছে। ফলে লোকনাটকের আলোকসজ্জায় এসেছে রূপান্তর। হ্যাজাক ও লণ্ঠনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে বৈদ্যুতিক আলো ও জেনারেটর।

সবশেষে বলা যায় লোকনাটকগুলি পূর্বে গ্রামের সম্পন্ন জমিদার বা জোতদার শ্রেণীর লোকেদের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিনীত হত। এমনকি লোকনাটকের কুশীলবদের যাবতীয় ভরণ পোষণের দায়-দায়িত্বও বহন করতেন এই ধরনের আর্থিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পাশাপাশি জোতদার ও জমিদারদের বিশাল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। ফলে যৌথ পরিবার ভেঙে যায় এবং আর্থিক দিক থেকে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে লোকনাটকের দলগুলির গ্রাসাচ্ছাদনের ভার তাঁরা আর বহন করতে পারে না। এই সহায়সম্বলহীন অবস্থায় অনেক দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। অনেক শিল্পী রোজগারের আশায় নতুন করে চাষ-আবাদ শুরু করে। এভাবে অনেক দল কালের সীমায় হারিয়ে যায়। কিন্তু জাতশিল্পী যাঁরা, যাঁদের রক্তের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে রয়েছে শিল্প, তাঁরা আবার বহু কষ্টে নিজেদের উদ্যোগে নতুন দল সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই সময়ে গ্রামগুলিতে পুরোদমে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল যাত্রা-থিয়েটার। তাই তখন লোকনাটকের দলগুলি যাত্রার অভিনয়ের পাশে নিজেদের অস্তিত্বের সংকট বুঝতে পেরেছিল। টিকে থাকার অদম্য ইচ্ছে থেকেই দলগুলি নিজেদের চেষ্টায় লোকনাটকের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। তাঁরা সমকালীন থিয়েটার, যাত্রা, সিনেমা প্রভৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দলকে নতুনভাবে পুনর্বিন্যাস করে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো অনুকরণ করে, কিংবা কোথাও কোথাও বর্জন করে লোকনাটককে তাঁরা নতুন রূপ দেয়। অবশ্যই এক্ষেত্রে লোকনাটকের মূল ফর্মকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। বলা যায়, তাঁদেরই সচেষ্ট কর্মের ফলশ্রুতি প্রচলিত বর্তমান লোকনাটকগুলি।

তথ্যসূত্র

১. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৮-৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. চার।

৩. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৫।

৪. পল্লব সেনগুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, পৃ. ২২৪।

৫. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৩৭।

৬. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৩৮-৩৯।

৭. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৮১।

৮. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৭।

৯. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৬৩।

১০. শিশির মজুমদার, দিনাজপুরের লোকনাট্য ঃ খন, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৭।

১১. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ২৬।

১২. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৭।

১৩. শিশির মজুমদার, দিনাজপুরের লোকনাট্য ঃ খন, একটি সমুদ্র পাখি বিহান, ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃ. ৩৬-৩৭।

১৪. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৮১।

১৫. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৬-২৭।

১৬. সাক্ষাৎকার ঃ দীনেশ চন্দ্র রায় (৬৩), রাউতপল্লী, ময়নাগুড়ি, তাং- ০৫.০২.২০১০।

১৭. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৪৭।

১৮. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. চার।

১৯. সাক্ষাৎকার ঃ নগেন্দ্রনাথ রায় (৬০), চৈতন্যপুর, শিবমন্দির, দার্জিলিং, তাং-১০.০৯.২০১০।

২০. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. চার।

২১. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য-নাটক-কথা, পৃ. ৪৩।

২২. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৩৭।

২৩. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ১৮১।

২৪. শিশির মজুমদার, দিনাজপুরের লোকনাট্য ঃ খন, একটি সমুদ্রপাখি বিহান, ৫ বর্ষ ১ সংখ্যা, পৃ. ৩৭।

২৫. শ্রী সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত, বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক আলোচনা এবং সংগ্রহ, পৃ. ৬৩।

২৬. পুষ্পজিৎ রায়, গম্ভীরা, পৃ. ২৬।

২৭. শিশির মজুমদার, লোকনাট্য ঃ পালাটিয়া, মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, পৃ. ৩৬৯।

২৮. মানস মজুমদার, লোকঐতিহ্যের দর্পণে, পৃ. ১৩৭।